চড়ক পূজা ও নববর্ষের সূচনা

ইরানী বিশ্বাস

হিন্দু ধর্ম অনুসারে শিব-উপাসক বাণরাজা দ্বারকাধীশ কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে মহাদেবের প্রীতি উৎপাদন করে আকাঙ্ক্ষায় ভক্তিসূচক নৃত্যগীত ও নিজ গাত্ররক্ত দ্বারা শিবকে তুষ্ট করে অভিষ্ট সিদ্ধ করেন। সেই স্মৃতি ধরে রাখতে শৈব সম্প্রদায় এই দিনে শিবপ্রীতির উৎসব করে থাকেন। এটাই চড়ক বা নীল পূজা নামে পরিচিত। চড়ক পূজা চৈত্রসংক্রান্তিতে অর্থাৎ চৈত্র মাসের শেষ দিবসে পালিত হয়। এ পূজার বিশেষ অঙ্গের নাম নীলপূজা। এই সব পূজার মূলে রয়েছে ভূতপ্রেত ও পুনর্জন্মবাদের ওপর বিশ্বাস। এর বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রাচীন কৌমসমাজে প্রচলিত নরবলির অন্যরূপ।

চড়ক পূজার আগের দিন নীলচণ্ডিকার পূজা হয়। এদিন কয়েক জনের একটি দল সারা গ্রাম ঘুরে বেড়ায়। দলে থাকে একজন শিব ও দু'জন সখী। সখীদের পায়ে থাকে ঘুঙুর। তাদের সঙ্গে থাকে ঢোল-কাঁসরসহ বাদক দল। সখীরা গান ও বাজনার তালে তালে নাচে। এদেরকে দেল বা নীল পাগলের দলও বলা হয়। এরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে গাজনের গান গায় এবং নাচ-গান পরিবেশন করে। বিনিময়ে দান হিসেবে যা কিছু পাওয়া যায় তা দিয়ে হয় পূজা। এদিন রাতে হাজরা পূজা হয় এবং শিবের উদ্দেশ্যে খিচুড়ি ও শোল মাছ নিবেদিত হয়। মাঝরাতে শিবের আরাধনার সময়ে দু'একজন সন্ন্যাসী প্রবল বেগে মাথা ঘুরিয়ে মন্ত্র বলতে বলতে সঙ্গাহীন হয়ে পড়েন। এই অবস্থাকে দেবতার ভর বলা হয়। এ সময় তারা দর্শকমণ্ডলীর প্রশ্নের যা উত্তর দেয় তা অভ্রান্ত বলে সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে।

চড়ক পূজা কবে, কীভাবে শুরু হয়েছিল তার সঠিক ইতিহাস জানা যায়নি। জনশ্রুতি আছে, ১৪৮৫ খ্রিষ্টাব্দে সুন্দরানন্দ ঠাকুর নামের এক রাজা এই পূজা প্রথম শুরু করেন। তবে লিঙ্গপুরাণ বৃহদ্ধর্মপুরাণ এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে চৈত্র মাসে শিবারাধনা প্রসঙ্গে নৃত্যগীতাদি উৎসবের উল্লেখ থাকলেও চড়ক পূজার উল্লেখ নেই। পূর্ণ পঞ্চদশষোড়শ শতাব্দীতে রচিত গোবিন্দানন্দের বর্ষক্রিয়াকৌমুদী ও রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্বে এ পূজার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

রাজ পরিবারের লোকজন এই পূজা আরম্ভ করলেও চড়কপূজা কখনও রাজ-রাজাদের পূজা ছিল না। এটি ছিল হিন্দু সামজের লোকসংস্কৃতি। পূজার সন্ন্যাসীরা প্রায় সবাই হিন্দু ধর্মের কথিত নিচু সম্প্রদায়ের লোক। তাই এই পূজায় কখনও কোনও ব্রাহ্মণের প্রয়োজন পড়ে না। এই পূজার অপর নাম নীলপূজা। তবে গম্ভীরা পূজা বা শিবের গাজন নামেও পরিচিত। এই পূজার আগের দিন চড়ক গাছটিকে ধুয়ে-মুছে পরিস্কার করা হয়। এতে জলভরা একটি পাত্রে শিবের প্রতীক শিবলিঙ্গ রাখা হয়। যা পূজারিদের কাছে বুড়োশিব নামে পরিচিত। শিবলিঙ্গকে চড়কগাছে স্থাপন করে চড়কগাছের গায়ে বেঁধে রাখা বড়শি পিঠে বিঁধিয়ে চক্রাকারে প্রদিক্ষণ করা হয়।

সাধারণের চোখে এটি যাতনাময় অনুষ্ঠান হলেও ভক্তদের হৃদয়ে অপার আনন্দের বার্তা বহন করে। শিবের নামে উদ্দাম জয়ধ্বনি দিয়ে এই চক্রাকারে আবর্তনকে যদি তন্ত্রের দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যায়, তাহলে জলভরা পাত্রের শিবলিঙ্গ আসলে সাঙ্খ্যের পুরুষতত্ত্ব। তাকে ঘিরে থাকা জলরাশি প্রকৃতিরূপিণীর সমতুল্য। আর এই চক্রাকার আবর্তন সংসারচক্রে জীবের জন্মজন্মান্তর ধরে পরিভ্রমণের প্রতীক। অর্থাৎ আদি প্রকৃতি তার গর্ভে পুরুষতত্ত্বের ধারন করে স্বীয়লীলায় এই জগতকে সঞ্চালন করেন। আবার এই নিরন্তর ঘূর্ণায়নের মধ্যে ভক্তের আনন্দ যেন আদিতন্ত্রের ভাবানুসারী। যেখানে ত্রিতাপজর্জরিত সংসারচক্রের স্বরূপ জেনেও সাধক মোক্ষ প্রত্যাখ্যান করে। এবং সেই আবর্তনের মধ্যেই প্রকৃতির নিত্যলীলার মহাসুখসাগরের অনুসন্ধান করে। এই আদিম বস্তুবাদী লোকায়ত তত্ত্বই বিদগ্ধ মননে চৈতন্যদেবের পঞ্চম পুরুষার্থ বা সহজযানের সহজানন্দ বা রামপ্রসাদের নির্বাণের উর্ধ্বে ভক্তির মহিমাকীর্তনের মাধ্যমে পরিশিলিত রূপে আবির্ভূত হয়েছে।

চড়ক পূজার দিন সন্ন্যাসীরা বিশেষ বিশেষ ফল, ফুল নিয়ে বাদ্য সহকারে নানা ভঙ্গিমায় শিবপ্রণাম করে। পতিত ব্রাহ্মণগণ এই পূজায় পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করেন। পূজার বিশেষ অঙ্গ হলো কুমিরের পূজা, জলন্ত অঙ্গারের ওপর হাটা, কাঁটা অথবা ছুরির ওপর লাফানো, বাণফোঁড় শিবের বিয়ে অগ্নিনৃত্য, চড়কগাছে দোলা বা দানো বারানো বাহাজারো পূজা করা। এছাড়া দেবতার অবিচল ভক্তি ও নিষ্ঠা প্রদর্শনের জন্য তারা ধারালো বটি, গাছের কাঁটার ওপর ঝাঁপ দেন। আবার পা'দুটো উপরে মাথা নিচের দিকে রেখে ঝুলে থাকেন। এগুলি যথাক্রমে বটি-ঝাঁপ, কাঁটা-ঝাপ ও ঝুল-ঝাপ নামে পরিচিত।

আরো আত্মনির্যাতনের জন্য আড়াই থেকে ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা একটি লৌহশলাকা সারাদিন জিভে বিদ্ধ করে রেখে সন্ধ্যার আগে পুকুরে গিয়ে সেটি খুলে ফেলে দেওয়া হয়, এর নাম 'বাণ-সন্ন্যাস'। পিঠের দুদিকে চামড়া ভেদ করে একটি সরু বেত প্রবেশ করিয়ে দেওয়াকে বলে 'বেত্র-সন্ন্যাস'। আর চড়ক গাছটি চড়কতলায় প্রোথিত করে তার মাথায় আরেকটি কাষ্ঠখণ্ড মধ্যস্থলে ছিদ্র করে স্থাপন করা হয়, যাতে চড়কগাছকে কেন্দ্র করে কাষ্ঠখণ্ডটি শূন্যে বৃত্তাকারে ঘুরতে পারে। এর এক প্রান্তের ঝোলানো দড়িতে একজন সন্ন্যাসী কোমরে গামছা বা কাপড় বেঁধে ঝুলে থাকেন, অপর প্রান্তে কাষ্ঠখণ্ডটিকে চক্রাকারে চরকির মতো ঘোরানো হয়, এই প্রক্রিয়াটির নাম বড়শি সন্ন্যাস।

চড়ক পূজায় বিশেষ বৈশিষ্ট্য ভক্তের পিঠে লোহার হুক বা বড়শি লাগিয়ে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। হুক লাগানো অবস্থায় ঘুরতে থাকে ভক্ত। ঘোরা শেষ হলে রক্ত বা কাটা চিহ্ন মিলিয়ে যায়। অন্তজ সম্প্রদায়ভুক্তদের একটি বড় ধর্মীয় উৎসব হিসেবে এই পূজা বা মেলা বিবেচিত হয়ে আসছে। এই বিশেষ দিনে চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হলেও এর প্রস্তুতি চলে টানা পনের দিন। শিবপার্বতীর পালা গেয়ে আয়োজকরা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়। চাল-ডাল, টাকা-পয়সা, মাগন বা ভিক্ষা তুলে পূজার খরচ জোগাড় করে। চড়ক পূজাকে ঘিরে এই উৎসব উপভোগ করতে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে অগণিত শিশু, নারী ও পুরুষের সমাগম ঘটে। শিব-পার্বতীর পালা উৎসব অন্তজ শ্রেণির মধ্যে দেখা গেলেও এটি আবহমান বাংলার একটি পরিচিত উৎসব।

পূজার উৎসবে নানা রকমের দৈহিক যন্ত্রণা ধর্মের অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়। চড়কগাছে ভক্ত বা সন্ন্যাসীদের লোহার হুড়কা দিয়ে চাকার সঙ্গে বেঁধে দ্রুতবেগে ঘোরানো হয়। তার পিঠে হাতে পায়ে জিহ্বায় এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গে বাণ শলাকা বিদ্ধ করা হয়। কখনো কখনো জলন্ত লোহার শলাকা তার গায়ে ফুড়ে দেওয়া হয় । ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার আইন করে বন্ধ করলেও গ্রামবাংলার যেসব অঞ্চল মূলত কৃষিপ্রধান সেখানেই চড়ক উৎসব হয়ে থাকে। চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়ক উৎসবের মধ্যে শুভ সূচনা হয় নববর্ষের। সাধারণত চড়ক উৎসবের মধ্য দিয়ে বৈশাখের প্রথম দিন শুরু হয়।